بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ১৩ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা এ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাঝে দেখতে পাই। মহানবী (সা.)-এর ইবাদত এবং এ সম্পর্কে তাঁর নিজের অনুসারীদের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি এবং যিকরে ইলাহীর নিয়মাবলি শেখানোর বিভিন্ন ঘটনা সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব ঘটনা বর্ণনা করব যা তিনি তাঁর মনিব মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে সম্পাদন করেছেন এবং যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, গুরুদাসপুর জেলার লঙ্গরওয়াল নিবাসী মির্যা মুহাম্মদ দীন সাহেব তাঁকে লিখে পাঠিয়েছেন, শৈশবকাল থেকেই আমার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার সুযোগ হয়েছে। আর সর্বপ্রথম আমি তাঁকে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের জীবদ্দশায় দেখেছিলেন, যখন আমি একেবারেই ছোটো ছিলাম। তাঁর [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] অভ্যাস ছিল, রাতে এশার পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন এবং এরপর রাত প্রায় একটার দিকে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। তাহাজ্জুদ পড়ে তিনি নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর যখন ফজরের আযান হতো, তখন সুন্নত (নামায) বাড়িতে পড়ে নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন এবং বাজামা'ত নামায পড়তেন। কখনও তিনি নিজেই নামায পড়াতেন, আবার কখনও মসজিদের ইমাম মিয়াঁ জান মুহাম্মদ সাহেব নামায পড়াতেন। নামায থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। আমি তাঁকে মসজিদে সুন্নত নামায পড়তে দেখি নি। তিনি সুন্নত নামায বাড়িতেই পড়তেন।

হযরত মসীহ্ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ইবাদত করার শক্তি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন, এটি প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য নয় যে, সে নিজের শক্তিসামর্থ্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে এমনটি করবে। কারণ তিনি (আ.) বলেছেন, "আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা এক বিশেষ শক্তি দিয়েছেন।" যাহোক, তিনি নিজের অবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা নিম্নরূপ। তিনি (আ.) বর্ণনা করেন,

"আমি কখনও কঠোর সাধনা করি নি এবং বর্তমান যুগের কোনো কোনো সূফীর মতো কঠোর সাধনায় নিজেকে ঠেলে দিই নি। নির্জনবাসের আয়োজন করে কোনো চিল্লাকাশিও করি নি আর সুন্নত পরিপন্থি এমন কোনো বৈরাগ্য অবলম্বন করি নি যা সম্পর্কে খোদা তা'লার কালাম বা বাণীর কোনো আপত্তি থাকবে। বরং আমি সর্বদা এমন সব ফকির ও বিদআতপন্থীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলাম, যারা হরেক প্রকার বিদআতে লিপ্ত হয়। তবে আমার শ্রদ্ধেয় পিতার জীবদ্দশাতেই, যখন তাঁর মৃত্যুকাল খুবই সন্নিকটবর্তী ছিল, একদা এমন হলো, পবিত্র চেহারার অধিকারী একজন বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গকে আমি স্বপ্নে দেখি। তিনি বলেন, ঐশী জ্যোতি আকর্ষণের জন্য রোযা রাখা নবী-পরিবারের সুন্নত; [অর্থাৎ, আল্লাহ্

তা'লার ঐশী জ্যোতিকে স্বাগত জানানোর জন্য রোযা রাখা নবীদের একটি রীতি। আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিতে স্বপ্নযোগে তাঁকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই মর্যাদায় ভূষিত করতে যাচ্ছেন।] যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, এটি উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন, আমি যেন নবী-রসূলদের পরিবারের এই সুন্নত পালন করি। কাজেই আমি কিছুকাল রোযা রাখা যথার্থ জ্ঞান করি। কিন্তু একইসাথে এই চিন্তাও ছিল, এই কাজটি গোপনে সম্পাদন করাই উত্তম হবে। তাই আমি এ পন্থা অবলম্বন করি যে, বাড়ি থেকে আমার খাবার পুরুষদের বসার ঘরে আনাতাম এবং এরপর সেই খাবার গোপনে কিছু এতীম শিশুকে দিয়ে দিতাম, যাদেরকে আমি আগে থেকেই যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলে দিয়েছিলাম। এভাবে সারা দিন রোযায় অতিবাহিত হতো এবং খোদা তা'লা ছাড়া এসব রোযার কথা কেউ জানত না। দু-তিন সপ্তাহ পর আমি বুঝতে পারি, এভাবে এক বেলা ভরপেট আহার করে রোযা রাখায় আমার কোনো কষ্টই হচ্ছে না। তাই আহারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া শ্রেয় হবে। কাজেই, সেদিন থেকে আমি আহারের পরিমাণ কমাতে থাকি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি পুরো দিন-রাত মাত্র একটি রুটি খেয়েই পার করে দিতাম। আর এভাবে আমি আহারের পরিমাণ কমাতে থাকি; এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সম্ভবত অষ্টপ্রহরে মাত্র কয়েক তোলা রুটিই ছিল আমার আহার্য। চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র সামান্য একটু রুটি খেতাম। প্রায় আট বা নয় মাস পর্যন্ত আমি এমনটিই করেছি। খাবারের এই চরম স্বল্পতা সত্ত্বেও– যা খেয়ে একটি দু-তিন মাসের শিশুও জীবন ধারণ করতে পারে না– আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর সেই সময়ের রোযার নিদর্শমূলক অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে একটি হলো সেসব সূক্ষ্ম দিব্যদর্শন যা সেই সময়ে আমার কাছে উম্মেচিত হয়েছিল। যেমন, পূর্ববর্তী কতিপয় নবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং এই উম্মতের উচ্চস্তরের যেসব 'আউলিয়া' গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। একদা পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় হাসান, হুসাইন, আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-সহ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দর্শন লাভ করি। এটি কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এক প্রকার জাগ্রত অবস্থা ছিল। মোটকথা, এভাবে অনেক পবিত্র মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়, যাদের কথা বলতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে। এছাড়া আধ্যাত্মিক জ্যোতির্মালা রূপকভাবে সবুজ ও লাল বর্ণের স্তম্ভের আকারে এমন মনোহর ও চিত্তাকর্ষক রূপে দৃষ্টিগোচর হতো যা লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। সেই জ্যোতির্ময় স্তম্ভগুলো সরাসরি আকাশ-পানে উঠে যাচ্ছিল, [অর্থাৎ ভূমি থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছিল,] যার কিছু ছিল উজ্জ্বল শুভ্র এবং কিছু ছিল লাল। এগুলোর সাথে হৃদয়ের এমন এক গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তা দেখে হৃদয় পরম প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। আর পৃথিবীতে এমন কোনো স্বাদ নেই, যেরূপ স্বাদ বা আনন্দ এগুলো দেখে হৃদয়ে ও অন্তরে সৃষ্টি হতো। আমার ধারণা, সেই স্তম্ভগুলো খোদা ও বান্দার ভালোবাসার সংমিশ্রণের এক রূপক বহিঃপ্রকাশ ছিল। অর্থাৎ একটি ছিল সেই জ্যোতি যা (বান্দার) হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং অপরটি ছিল সেই জ্যোতি যা ওপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল; আর উভয়টি মিলে এক স্তম্ভের রূপ ধারণ করেছিল।" [অর্থাৎ, স্তম্ভগুলো এমন ছিল যা নীচ থেকে ওপরে এবং ওপর থেকে নীচে আসছিল এবং পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে স্তম্ভের রূপ ধারণ করছিল।] এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় যা জগদ্‌বাসী চিনতে পারে না, কারণ এগুলো জগদ্‌বাসীর দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু জগতে এমন মানুষও আছেন যারা এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন।

মোটকথা এই সময়কাল পর্যন্ত রোযা রাখার ফলে আমার কাছে যেসব বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল বিভিন্ন প্রকার মুকাশিফাত বা দিব্যদর্শন। এছাড়া আমার আরেকটি লাভ হয়েছিল; এই কঠোর সাধনার পর আমি নিজ সত্তাকে এমন অবস্থায় পাই যে, প্রয়োজনে আমি দীর্ঘ সময় অনাহারে যাপন করতে পারি। আমি অনেকবার ভেবেছি, যদি কোনো স্থূলকায় ব্যক্তি– যে স্থূলতার পাশাপাশি একজন পালোয়ানও বটে– তাকে যদি আমার সাথে অনাহারে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আহারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হবার পূর্বেই সে মারা যাবে। এর মাধ্যমে আমি এই প্রমাণও পাই যে, মানুষ অনাহারে থাকার কল্যাণে কিছুটা উন্নতি করতে পারে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দেহ এমন কষ্টসহিষ্ণু না হয়, আমার বিশ্বাস– এমন আরামপ্রিয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মোকাম বা আধ্যাত্মিক মার্গ অতিক্রমের যোগ্য হতে পারে না।"

কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, "তবে আমি প্রত্যেককে এরূপ করতে পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি সবাইকে এটি করতে বলি না এবং আমিও নিজের ইচ্ছায় তা করি নি। এটি তো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে করেছিলাম। আমি এমনও অনেক নির্বোধ দরবেশ দেখেছি, যারা কঠোর সাধনা করেছে এবং অবশেষে মস্তিষ্কের শুষ্কতার ফলে তারা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।" অর্থাৎ মগজ শুকিয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের বাকি জীবন পাগলামিতে কেটেছে অথবা তারা যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি সমান হয় না। অতএব, প্রাকৃতিকভাবেই যেসব ব্যক্তি দুর্বল, তাদের জন্য কোনো প্রকার শারীরিক কঠোর সাধনা অনুকূল হতে পারে না এবং তারা অতি দ্রুত কোনো বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যাহোক, ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম, এছাড়া এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্যেরও ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, তাই সবাই যেন এই চেষ্টা না করে। আমি যা করেছি, তা প্রত্যেকেই করতে পারবে– এমনটি নয়। তাই উত্তম হলো, মানুষ যেন মনগড়া কথার অনুসরণে নিজেকে কঠোর সাধনায় ব্রতী না করে এবং 'দীনুল আজায়িয' (সাধারণ ধর্মাচার) অবলম্বন করে। [সাধারণের জন্য ধর্মের যে ছাড়গুলো রয়েছে বা সাধারণ যে ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলো পালনের দায়িত্ব একজন মানুষের ওপর বর্তায়, বা সুন্নতের ওপর আমল করা– সে যেন এগুলোই অবলম্বন করে।] অবশ্য যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো ইলহাম হয় এবং তা ইসলামের সমুজ্জ্বল জীবনবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তা পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ অজ্ঞ পীর-ফকির যে কঠোর সাধনা শেখায়, তাদের পরিণাম ভালো হয় না। সুতরাং এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

এখনো কেউ কেউ বলে যে, এটা করো, ওটা করো; এমন লোকদের কথা মানা উচিত নয়। বরং আজকাল তো টিভি অনুষ্ঠানগুলোতেও এসব দেখানো হয়। মানুষের দেখা উচিত, মধ্যপন্থা কী এবং সেটি অবলম্বন করা উচিত। আর নিজের যতটুকু সাধ্য রয়েছে, সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার আদায় করার চেষ্টা করা উচিত এবং ইবাদতের যে পদ্ধতি ও ন্যূনতম মান মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন, তা অবশ্যই অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত আর এরপর তাতে উন্নতি করতে থাকা উচিত। ধীরে ধীরে উন্নতিও সাধিত হয়। কিন্তু যাহোক, ইসলাম অকারণে নিজেকে কষ্টে নিপতিত করতে নিষেধ করেছে এবং তিনি (আ.)ও এটি নিষেধ করেছেন।

শৈশব থেকে তাঁর অবস্থা কেমন ছিল– সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মিস্ত্রী ফকীর মুহাম্মদ সাহেব বলেন, আমার বাবা, যাঁর নাম ছিল 'জীওয়া', তিনি শোনাতেন

যে, একবার মির্যা সাহেব ছাদ থেকে পড়ে যান এবং প্রচণ্ড আঘাত পান। আমরা জানতে পারি, মির্যা সাহেব ছাদ থেকে পড়ে গেছেন। তাই আমরা তাঁর খোঁজখবর নেবার জন্য যাই। তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, নামাযের সময় হয়েছে কি না। নামাযের প্রতি তাঁর এতটাই ভালোবাসা ছিল! আমি তখন ছোট ছিলাম যখন তিনি এই কথা শোনাতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। (তিনি বলেন,) ১৮৯৫ সালে যখন রমযান মাস কাদিয়ানে অতিবাহিত করার সুযোগ হয়, আমি পুরো মাস হুযূর (আ.)-এর পেছনে তাহাজ্জুদ নামায অর্থাৎ তারাবীহ্ আদায় করি। তাঁর অভ্যাস ছিল, বিতর রাতের প্রথমাংশেই পড়ে নিতেন এবং দুই রাকআত করে তাহাজ্জুদ নামাযের আট রাকআত রাতের শেষাংশে আদায় করতেন; যার মাঝে তিনি সর্বদা প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী অর্থাৎ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ থেকে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন আর রুকু ও সিজদায় يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ দোয়াটি পাঠ করতেন। তিনি এমন স্বরে পড়তেন যে, আমি তা শুনতে পেতাম। অর্থাৎ ধীরে ধীরে পড়তেন যা উচ্চ স্বরও ছিল না আবার একদম নীচুও না।

তাছাড়া তিনি সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাযের পর সেহরী খেতেন এবং এতে এত দেরি করতেন যে, কখনো কখনো খেতে খেতে আযান হয়ে যেত এবং তিনি কোনো কোনো সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, আসল বিষয় হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেহরী খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ফজরের আযানের সময়টিই সুবহে সাদিক উদিত হবার ওপর নির্ধারিত; তাই লোকেরা সাধারণত আযান হওয়াকে সেহরীর (শেষ সময়) মনে করে নেয়। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, কাদিয়ানে যেহেতু ফজরের আযান সুবহে সাদিক হতেই হয়ে যায় এবং এটিও সম্ভব, কখনো কখনো ভুল বা অসতর্কতাবশত তার আগেই হয়ে যায়, তাই এমন সব ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের তেমন পরোয়া করতেন না এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সেহরী খেতে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের উদ্দেশ্যও এই বিষয়ে এটি নয় যে, যখন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক হিসাবে সুবহে সাদিক শুরু হবে, তার সাথে সাথেই খাবার বর্জন করতে হবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, যখন সাধারণের দৃষ্টিতে ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পায়, তখন খাবার ত্যাগ করা উচিত। বস্তুত 'তাবাইয়্যুন' (সুস্পষ্ট হওয়া) শব্দটি এই বিষয়টিই প্রকাশ করছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'বেলালের আযানে সেহরী ত্যাগ কোরো না, বরং ইবনে মাকতুমের আযান পর্যন্ত নিঃসন্দেহে পানাহার করতে থাকো।' কারণ ইবনে মাকতুম অন্ধ ছিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের মাঝে শোরগোল না পড়ে যেত যে, 'সকাল হয়ে গেছে', ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

যাহোক, এখন তো যুগ আরো আধুনিক হয়ে গিয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুবহে সাদিকের সঠিক সময়ও জানা যায়। তাই সাধারণত আযানের শেষ সময়সীমা নির্ধারিত থাকে আর চেষ্টাও এটিই করা হয়। কখনো কখনো হতে পারে যে, ভুলও হয়ে যায়; কিন্তু যদি কোথাও ভুলবশত আযান আগেও হয়ে যায়, তাহলেও নীতি তা-

ই হবে যা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু রমযান মাসও শুরু হতে যাচ্ছে, তাই এই এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিলাম। কিন্তু মানুষের এতটাও শিথিল হওয়া উচিত নয় যে, তারা তাকিয়ে থাকবে– দিন হয়েছে নাকি হয় নি! যাহোক, আমাদের আযান এবং সময়সূচি ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করে এবং উত্তম গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু বর্তমান যুগ সেই যুগের চেয়ে অধিক বৈজ্ঞানিক যুগ, তাই ভুলের সম্ভাবনা সাধারণত কম থাকে। এ কারণে সেই সময়সূচিই অনুসরণ করা উচিত এবং তার ওপরই আমল করা উচিত, যা প্রতিটি এলাকা ও দেশের সময়সূচি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার 'নামাযে ইস্তিস্কা' (বৃষ্টির জন্য নামায) পড়া হয়েছিল, যাতে হুযূর (আ.) অংশ নিয়েছিলেন এবং সম্ভবত মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেব ইমামতি করেছিলেন। লোকেরা এই নামাযে অনেক কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু হুযূর (আ.)-এর আত্মসংযম ছিল পরম মার্গের; তাই আমি তাঁকে কাঁদতে দেখি নি। আমার মনে আছে, এরপর খুব শীঘ্রই মেঘ জমে বৃষ্টি হয়েছিল; বরং সম্ভবত সেই দিনই বৃষ্টি হয়েছিল। যাহোক, এতে কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, তিনি (আ.) নামাযে প্রকাশ্যে কাঁদতেন না। তাঁর মনিব (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর ইবাদতের এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, সিজদারত অবস্থায় তাঁর বুক থেকে এমন শব্দ আসত যেন টগবগ করে হাঁড়ি ফুটছে। তিনি সিজদায় পড়ে থাকতেন এবং অত্যন্ত বেদনার সাথে কান্নাকাটি ও আহাজারি করতে থাকতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন যে, আমাদের মাতা বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া সাধারণত দুই ধরনের নফল পড়তেন। একটি হলো দুই বা চার রাকআত ইশরাকের নামায, যা তিনি মাঝেমধ্যে পড়তেন, এতে তিনি নিয়মিত ছিলেন না। আর দ্বিতীয়টি হলো আট রাকআত তাহাজ্জুদের নামায, এটি তিনি নিয়মিত পড়তেন; তবে খুব বেশি অসুস্থ হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তিনি তাহাজ্জুদের সময় বিছানায় শুয়ে শুয়েই দোয়া করে নিতেন এবং শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে সাধারণত বসে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

হযরত মৌলভী ইয়াকুব আলী সাহেব লেখেন, যখন তিনি মামলা পরিচালনার জন্য যেতেন, নিজ পিতার প্রতি আনুগত্যের দায়িত্ব পালন করার জন্যই যেতেন। সেখানে তিনি এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যে মামলা চলাকালে কোনো নামায যেন কখনো কাযা না হয় এবং তিনি কখনো কাযা করেনওনি। একইভাবে তিনি সেইসব আবশ্যিক কর্তব্যের প্রতিও উদাসীন হতেন না যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। ঠিক আদালতে থাকা অবস্থায়ও তিনি নামাযের ওয়াক্তে এমনভাবে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন যেন তাঁর অন্য কোনো ব্যস্ততাই নেই। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, তিনি (আ.) নামাযে নিমগ্ন আছেন এবং অন্যদিকে মামলার জন্য ডাক পড়ে গেছে, কিন্তু তিনি (আ.) পূর্বের মতোই প্রশান্ত চিত্তে নামাযে রত।

একবার তিনি (আ.) বলেন, 'আমি বাটালায় একটি মামলার (হাজিরার) জন্য গিয়েছিলাম। তখন নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি নামায পড়তে শুরু করলাম। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায পড়া শুরু করলেন।] পিয়ন ডাক দিল, কিন্তু আমি নামাযে ছিলাম। দ্বিতীয় পক্ষ হাজির হয়ে যায় এবং সে একপক্ষীয় কার্যক্রমের সুযোগ নিতে

চাইল যে, বিবাদী পক্ষ হাজির হয় নি, তাই একতরফা রায় দেওয়া হোক। এর ওপর অনেক জোর দিল। কিন্তু আদালত কোনো ভ্রূক্ষেপ করে নি। মামলার রায় তার বিপক্ষে দিয়ে আমার পক্ষে ডিক্রি দিয়ে দেয়, অর্থাৎ আমার পক্ষে রায় দিয়ে দিল। আমি যখন নামায শেষ করে (আদালতের কক্ষে) গেলাম, তখন আমার ধারণা ছিল, হয়ত জজ সাহেব (তথা মামলার বিচারক) আমার অনুপস্থিতিকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকবেন। [কেননা আইন হলো, এক পক্ষ উপস্থিত না থাকলে তার বিপক্ষে রায় দিয়ে দেওয়া হয়।] কিন্তু আমি যখন উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি তো নামায পড়ছিলাম, তখন তিনি (জজ সাহেব) বললেন, 'আমি তো আপনার পক্ষে রায় প্রদান করেছি'। এটাও ইবাদতের কল্যাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে অনুগ্রহ করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত আম্মাজানের আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বাড়িতে মাগরিবের নামায পড়াতেন, তখন প্রায়ই সূরা ইউসুফের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন যাতে এই বাক্য রয়েছে: إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (সূরা ইউসূফ: ৮৭)। (অর্থাৎ) আমি তো আমার কষ্ট ও দুঃখ শুধু আল্লাহ্ তা'লার কাছেই নিবেদন করি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি এখানে বলে রাখছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কণ্ঠস্বরে ছিল বেদনা ও আর্তি এবং তিনি (আ.) সুললিত সূরে তিলাওয়াত করতেন।

অনুরূপভাবে, মির্যা মুহাম্মদ দীন সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আ.) মসজিদে ফরয নামায আদায় করতেন, তবে সুন্নত ও নফল নামাযগুলো বাড়িতেই পড়তেন। এশার নামাযের পর তিনি (আ.) ঘুমিয়ে পড়তেন এবং মধ্যরাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। এরপর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি (আ.) মাটির প্রদীপ জ্বালাতেন এবং ফজরের আযান পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

অন্য একজন জীবনীকার লিখেছেন যে, তাঁর (আ.) পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং তাঁর সমস্ত ইবাদত কখনো কুরআন ও সুন্নতের বাইরে ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করতেন। ইশরাকের নামাযও পড়তেন, কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি ছিল অত্যধিক ভালোবাসা। নামাযে তাঁর আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ এবং নিমগ্নতা এতটাই প্রবল ও গভীর হতো যে, মনে হতো, তিনি (আ.) এ জগতেই নেই। তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা ফাতিহা অত্যন্ত বেদনা ও মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং অনেক বেশি দোয়া করতেন।

শুরুতে কখনো কখনো নামাযে যদি মনোযোগ সৃষ্টি না হতো তখন তিনি (আ.) বার বার নামায পড়তেন এবং বলতেন: এই পদ্ধতি আমি এক মদ্যপ থেকে শিখেছি। তিনি (আ.) বলেছেন, একবার নামাযে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছিল না। তাই আমি জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম যে, সেখানে গিয়ে নামায পড়ব। যাহোক, পথে একটি বাজার ছিল। সেখানে এক হিন্দু তার এক বন্ধুকে বলছিল, রাতে আমি এক পেয়ালা মদ পান করেছি, কিন্তু নেশা হলো না। অতঃপর দ্বিতীয় পেয়ালা পান করেছি তবুও নেশা না হলে তৃতীয় পেয়ালা পান করি। মোটকথা সে এভাবে বার বার পান করতে থাকল, এমনকি শেষ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি (আ.) বলতেন, আমি ভাবলাম, আমিও বার বার নামায পড়ব যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক নেশা সৃষ্টি হয়। [ফরয নামায তো এভাবে (এতবার) পড়া যাবে না,

তাই নফলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল।] নফল নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, বার বার পড়ব, যতক্ষণ না পূর্ণ মনোসংযোগ হয়।

নামাযের পাশাপাশি তাঁর নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ পাঠ এবং ইস্তেগফার করার অভ্যাস ছিল। পবিত্র কুরআনের প্রতি তো তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল, তিনি (আ.) তো দিনে-রাতে, উঠতে-বসতে এবং হাঁটতে-চলতেও পড়তেন এবং অঝোরে কাঁদতেন, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। যদিও সেখানে (তথা ইস্তিসকার) নামাযে কাঁদেন নাই, তবে এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি কাঁদতেন না। তিনি কাঁদতেন, কুরআন শরীফ পাঠ করেও তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন। দরূদ অজস্র ধারায় পড়তেন, বুঝে বুঝে এবং এত গভীর বেদনার সঙ্গে পাঠ করতেন যে, অনেক সময় এর সাথে ক্রন্দন ও অঝোর অশ্রুপাতও দেখা যেত।

একবার ইশরাকের নামায পড়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন; এখানে প্রথমে তিনি মধুর গুরুত্ব ও প্রজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করেন আর কথা শেষ পর্যন্ত ইবাদতের বিষয়ে গিয়ে পর্যবসিত হয়। মধু ও ডায়াবেটিস রোগ প্রসঙ্গে কথা ওঠে যে, ডায়াবেটিস রোগে মধু খাওয়া উচিত কি না। তিনি (আ.) বলেন, ডায়াবেটিসের কারণে আমি খুব কষ্টে ছিলাম। ডাক্তাররা এতে মিষ্টি খুবই ক্ষতিকর বলে আখ্যা দেন। অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগীর জন্য মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। তিনি বলেন, আজ আমি এ বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার মনে হলো, বাজারের যে সকল চিনি ইত্যাদি পাওয়া যায় তা প্রায়ই অসৎ লোকেরা প্রস্তুত করে থাকে; যদি তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু 'আস্‌ল্' অর্থাৎ মধু তো আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে তৈরি হয়, তাই এর গুণাগুণ অন্যান্য মিষ্টির মতো কখনোই হতে পারে না। যদি তা সেগুলোর মতো হতো, তবে সব মিষ্টি সম্পর্কে 'শিফাউল্ লিন্নাস' (মানুষের জন্য আরোগ্য) বলা হতো; কিন্তু কুরআনে শুধু এটিকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ বিশেষত্বই এর উপকারিতার প্রমাণ। যেহেতু এর প্রস্তুতি ওহীর মাধ্যমে হয়, তাই যে মৌমাছি ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে, নিশ্চয়ই তা উপকারী উপাদানই গ্রহণ করে। এটি ভেবে আমি সামান্য মধুর সঙ্গে কেওড়া মিশিয়ে পান করি। কিছুক্ষণ পরেই আমি খুবই ভালো বোধ করি, এমনকি আমি চলাফেরার শক্তি লাভ করি। [আগে ডায়াবেটিসের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।] এরপর আমি বাড়ির লোকদের নিয়ে বাগান পর্যন্ত চলে যাই এবং সেখানে ইশরাকের দশ রাকআত নামায আদায় করি।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, একবার ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেয়। সকল ঘরবাড়ি ও জিনিসপত্র কেঁপে ওঠে, মানুষ আতঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে ঘাবড়ে যায়। এমন সময়ে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌র অবস্থা দেখার মতো ছিল। কেননা আমরা হাদীসে পড়েছি, এমন কোনো দৈব-বিপর্যয় ঘটলে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খোদাভীতির গভীর প্রভাব প্রকাশ পেত; সামান্য মেঘ দেখলেও তিনি অস্থির হয়ে যেতেন– কখনো বাইরে যেতেন, কখনো ভেতরে আসতেন। সে সময়ও আল্লাহ্‌র নবী "হার কে আরেফ-তার আসত, তারসাঁ তার"– প্রবাদটিকে কার্যত সত্য করে দেখান। এটি একটি ফারসি প্রবাদ। এর অর্থ হলো, যে যত বেশি তত্ত্বজ্ঞানী হয় তথা আল্লাহ্‌কে চেনে, সে তত বেশি আল্লাহ্‌কে ভয় করে। যাহোক, ভূমিকম্প শুরু হতেই তিনি পরিবার-পরিজনসহ আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় মশগুল হন এবং নিজ প্রভুর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি

পুরো পরিবার ও খাদেমগণ সমেত কিয়াম, রুকু ও সিজদায় পড়ে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র অমুখাপেক্ষী বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবে ভীত ও ত্রস্ত থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আজকাল মানুষ যেহেতু দূরে দূরে বসবাস করে এবং মসজিদে আসা কঠিন ছিল; [সেই যুগের দূরত্বের নিরিখে কথা হচ্ছে আর তখন বাহনও ছিল না; তাই লোকেরা ঘরে আলাদা নামায পড়ে নিত;] হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ঘরে একা নামায পড়া উচিত নয়; বরং বাজামা'ত পড়া উচিত। তিনি বলেন, বাজামা'ত নামায পড়ার একটি ধরন হলো, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে নিয়ে ঘরেই বাজামা'ত নামায আদায় করা। [যদি মসজিদে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে ঘরেই বাজামা'ত নামায পড়ে নাও।] তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু দূরত্বের কারণে আলাদা নামায পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের অন্তরে বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব কমে গিয়েছে, তাই এই অভ্যাস পরিত্যাগ করো এবং বাজামা'ত নামায আদায়ের অভ্যাস সৃষ্টি করো। আমরা এ যুগেও এই দৃশ্য দেখতে পাই। আজও যে-সব স্থানে ঘাটতি আছে সেখানে মানুষজনের সচেতন হওয়া উচিত– ঘরে সন্তানদের নিয়ে নামায আদায় করুন। এতে শিশুদের মধ্যেও নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠবে। তারপর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদাহরণ দিয়েছেন যে, তিনি যখন মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে পারতেন না তখন তিনি ঘরেই জামা'তে নামায পড়াতেন। আর এটি খুবই বিরল, কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া তিনি একা নামায পড়তেন না। প্রায়ই তিনি আমাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে জামা'ত করাতেন এবং মায়ের সঙ্গে অন্য মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন।

হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ সাহেবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৩৫ সালে আমি সিয়ালকোটে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার সাক্ষাৎ হয় এক অতি বৃদ্ধা মহিলা মাঈ হায়াত বিবির সঙ্গে। তিনি ছিলেন ফযল দীন সাহেবের কন্যা এবং হাফেয কারী মুহাম্মদ শফী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতা। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হলে দেখি, মাঈ সাহেবা নিজ বাড়ির দোরগোড়ায় বসে ছিলেন। আমরা তাকে চিনতে পারি নি, কিন্তু তিনি আমাদের চিনে ফেললেন। সালাম দিয়ে বললেন, এদিকে চলে আসুন। মাঈ সাহেবার বয়স তখন ছিল ১০৫ বছর। তিনি জানান, সিপাহি বিদ্রোহর সময়ে এখানে যখন ভয়াবহ অরাজকতা চলছিল, [তিনি নিজের বয়সের কথা বলছেন আর বলেন,] অফিস ও আদালতে আগুন লাগানো হচ্ছিল, সেসময় আমি যুবতী ছিলাম। একথা উল্লেখ করার পর কথোপকথনের এক পর্যায়ে মাঈ সাহেবা বলেন, মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তার পরিচয় তখন থেকেই, যখন তিনি প্রাথমিক দিনগুলোতে সিয়ালকোটে আসেন এবং এখানে চাকরির সুবাদে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, তখন মির্যা সাহেব বয়সের এমন পর্যায়ে ছিলেন যখন সবেমাত্র মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করেছে, পূর্ণ দাড়ি হয় নি। সিয়ালকোটে আগমনের পর হযরত মির্যা সাহেব আমার পিতাকে বাড়িতে এসে ডাক দেন এবং বলেন, মিয়া ফযল দীন সাহেব! আপনার যে দ্বিতীয় বাড়িটি আছে, তা আমার থাকার জন্য দিয়ে দিন। [অর্থাৎ ভাড়া নিতে চাচ্ছিলেন।] আমার পিতা দরজা খুললে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। আমার পিতা পানি, খাট, জায়নামায ইত্যাদি রাখেন, এর সাথে মির্যা সাহেবের জিনিসপত্রও ভেতরে রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল– কোর্টকাচারি থেকে ফিরে প্রথমে আমার পিতাকে ডাকতেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। মির্যা সাহেবের অধিকাংশ সময়ই আমার পিতার সঙ্গে কাটত। তাঁর খাবারও আমাদের বাড়িতেই রান্না হতো এবং

আমার পিতাই সে খাবার মির্যা সাহেবের নিকট পৌঁছে দিতেন। মির্যা সাহেব ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতেন এবং আঙিনায় গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে লেগে যেতেন। আমার পিতা বলতেন, তিনি কুরআন মজীদ পড়তে পড়তে কখনো সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন, দীর্ঘ সিজদা করতেন এবং এত কাঁদতেন যে, মাটি ভিজে যেত। মাঈ সাহেবা হযরত মসীহ্ মওউদের কথা বলতে গিয়ে বার বার বলেন, আমার প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গিত! তিনি এ সাক্ষ্য তার ছেলের উপস্থিতিতে দিয়েছিলেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব, মৌলভী মীর হাসান সাহেবের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন– যিনি ড. আল্লামা ইকবাল সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত মির্যা সাহেব প্রথমে কাশ্মীরি মহল্লায়– যা এই অধমের বাসার নিকটেই অবস্থিত– উমরা নামক এক কাশ্মীরির বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন। কোর্টকাচারি থেকে ফিরে তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে যেতেন; কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো হেঁটে হেঁটে তিলাওয়াত করতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন। এমন বিনয়াবনতচিত্তে তিলাওয়াত করতেন যার তুলনা পাওয়া ভার। যুগের প্রথা অনুযায়ী মানুষ তাদের আদালতের কাজের জন্য বা সুপারিশের জন্য তাঁর কাছে আসত, যেমনটা সাধারণত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আসা হয়, যেন মামলার রায় তাদের পক্ষে যায়। মানুষের এমন অভ্যাসই হয়ে থাকে, তারা সুপারিশের জন্য চলে আসে আদালতে কর্মরত কোনো ব্যক্তির কাছে। তিনি লেখেন, ঘরের মালিক উমরার বড়ো ভাই ছিলেন ফযল দীন সাহেব যাকে সেই এলাকায় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার এমন কিছু মানুষকে কাচারিতে তার কাছে বসে থাকতে দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিঁয়া ফযল দীন সাহেবকে ডেকে বলেন, এই মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দিন– তারা যেন এখানে এসে নিজেদের সময় নষ্ট না করে, আর আমারও সময় নষ্ট না করে। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি বিচারক নই। আমার সাথে যতটা কাজের সম্পর্ক আছে আমি আদালতেই তা করে আসি। এরপর মিয়াঁ ফযল দীন সাহেব তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বিদায় করে দেন।

পাটিয়ালার জনৈক অআহমদী মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাত্র চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই সারাদিন কুরআন শরীফ পড়তেন এবং এর টীকায় নোট লিখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, ছোটোবেলাতেই তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তাঁর এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় যে, দুনিয়ার থেকে তাঁর মন উঠে যায়। একান্ত শৈশবেই তাঁর সমস্ত ইচ্ছা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

তাঁর (আ.) জীবনীকার শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব শৈশবের একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন, শৈশবে যখন তাঁর বয়স খুবই কম ছিল তখন তিনি সমবয়স্ক খেলার সাথি এক মেয়েকে বলেছিলেন, যার সাথে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহও হয়েছিল– তাকে বলতেন, হে হতভাগি! দোয়া করো যেন আল্লাহ্ আমাকে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করেন। এই বাক্যটি– যা অতি শৈশবকালের– তা থেকে বুঝা যায়, নিতান্ত শৈশব থেকেই তাঁর আবেগ-অনুভূতি কেমন ও কোন অভিমুখী ছিল! তাঁর আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু আশ্চর্যজনকভাবে কেবল আল্লাহ্ তা'লাকে কেন্দ্র করে ছিল! একইসাথে তাঁর সেই উন্নত বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাওয়া যায় যা শৈশব থেকেই তাঁর মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা এ বাক্য থেকে বুঝা যায়– সেসময়ও তিনি সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকারী হিসাবে আল্লাহ্

তা'লাকেই জানতেন। অর্থাৎ নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী আল্লাহ্ তা'লাকেই মনে করা এবং এরপর এমন এক ঘরে প্রতিপালিত হওয়া– যেখানকার ছোটো-বড়ো সবাই দুনিয়াকেই নিজেদের উপাস্য মনে করত– [তা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে] এমন কথা বের হওয়া এমন একটি হৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব যা দুনিয়ার সংমিশ্রণ থেকে সর্বতোভাবে পবিত্র এবং পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন:

'আমি ছোটবেলা থেকেই রোযা রাখতে অভ্যস্ত। শৈশবে একবার রোযা রাখলাম, অসুস্থ হয়ে পড়লাম; কিন্তু এরপর ঊনত্রিশটি রোযা পূর্ণ রাখলাম, কোনো কষ্ট হলো না। তখন আমার জন্য খুশির ঈদ ছিল। রোযার বিশেষ কল্যাণ রয়েছে; যেমন প্রতিটি ফলের আলাদা স্বাদ রয়েছে, তেমনই প্রতিটি ইবাদতের আলাদা স্বাদ রয়েছে। এসব ইবাদতের মাঝে এমন আধ্যাত্মিকতা রয়েছে যা মানুষের জন্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদি আগ্রহ থাকে তবে দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা কমে যায়। যা আবশ্যক তা হলো, ইবাদতের সময় মানুষের আত্মা অত্যন্ত বিগলিত হয়ে পানির মতো প্রবাহিত হয়ে খোদার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া।'

যমীনদার পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত নেতা জাফর আলী খান সাহেবের পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোটে অবস্থানকালীন ব্যস্ততা সম্পর্কে লেখেন, ১৮৭৭ সালে আমাদের এক রাত কাদিয়ানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। সেসব দিনেও ইবাদত ও যিকরে তাঁর নিমগ্নতা এত গভীর ছিল যে, মেহমানদের সাথেও কম কথাবার্তা বলতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানীর বরাতে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন: ১৯০০ সালের ঈদুল আযহার একদিন পূর্বে– যা হজ্জের দিন ছিল– হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালকে বলেন, 'আমি হজ্জের এই দিনটি বিশেষ দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করতে চাই। তাই যেসব বন্ধু দোয়ার আবেদন করতে চায়, আপনি তাদের নাম নিয়ে এবং তালিকা তৈরি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

হযরত ভাই সাহেব বর্ণনা করেন, সেদিন হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে দোয়ার প্রচুর আবেদন পৌঁছায় এবং কতিপয় সাহাবী সরাসরিও দোয়ার আবেদন লিখে হুযূরের সমীপে পাঠান। আর যেহেতু সেই যুগে ঈদের সময় বাইরের স্থানগুলো থেকেও অনেক বন্ধু ঈদের নামায পড়তে এবং হযরত মসীহ্ মওউদের সাক্ষাতে ধন্য হবার জন্য কাদিয়ান চলে আসতেন, তাঁরাও ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রদত্ত এই ব্যবস্থার অংশ হয়ে যান। আর এই দিনটি কাদিয়ানে বিশেষ দোয়া, অসাধারণ বিনয়াবনত প্রার্থনা এবং মহান বরকতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হতো– তা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, আমার মাথা-ঘোরার অবস্থা আজও ভালো নয়, মাথা ঘুরছে; [অর্থাৎ মাথা-ঘোরার অসুস্থতা ছিল;] যখন জামা'তের অর্থাৎ বাজামা'ত নামাযের সময় হয় তখন মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, সবাই (নামাযের) জামা'তে থাকবে, কিন্তু আমি শামিল হতে পারব না– [অর্থাৎ মানুষজন সবাই একত্রিত

হবে, বাজামা'ত নামায আদায় হবে, কিন্তু আমি শামিল হবো না!]– তখন (এটি ভেবে) খুবই দুঃখ হয়। এজন্য কষ্টেসৃষ্টে হলেও চলে আসি। আজও মাথা ঘুরছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যেভাবে পারি, কষ্ট করে কোনোক্রমে মসজিদে চলেই এসেছি। তিনি বলেন, যা-ই হোক, চেষ্টাচরিত্র করে আমি মসজিদে চলে আসি। আর কেবল একবারের ঘটনা নয় এটি, অনেকবার এরূপ ঘটে; আজও এমনটিই হয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থতার দিনগুলোতেও তিনি (আ.) বাজামা'ত নামায পড়ার চেষ্টা করতেন।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি বলেন, তাঁর সাক্ষাতের স্থান সাধারণত মসজিদই হয়ে থাকে। তিনি যদি অসুস্থ না থাকেন তবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'তের সাথে পড়েন এবং জামা'তের সাথে নামায পড়ার জন্য অত্যন্ত তাগিদ দেন। এবং তিনি বার বার বলেছেন, জামা'তের সাথে নামায না পড়া হলে আমি যতটা দুঃখ পাই, অন্য কোনো বিষয়ে আমি ততটা দুঃখ পাই না।

মৌলভী সাহেব আরো লেখেন, আমার মনে আছে, যখন মানুষের আসা-যাওয়া কম ছিল, তিনি খুব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন, হায়! যদি আমাদের নিজস্ব একটি জামা'ত হতো, যাদের সাথে মিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যেত! আর তিনি বলতেন, আমি দোয়া করছি এবং আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া কবুল করবেন।

এখন [অর্থাৎ মৌলভী সাহেবের একথা লেখার সময়] আল্লাহ্‌র কৃপায় নামাযীর সংখ্যা আশি-নব্বইজন হয়। [বর্তমানে তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি দেশে আমাদের মসজিদও রয়েছে; তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন আমাদের মসজিদগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী দিয়ে পূর্ণ করি এবং প্রতিটি নামায জামা'তের সাথে পড়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করি।]

মৌলভী সাহেব লেখেন, নামায আদায় করার পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে চলে যেতেন এবং লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এরপর মাগরিবের নামাযের পর তিনি মসজিদে বসে থাকতেন এবং বন্ধুদের সাথে মিলে সেখানেই খাবার খেতেন এবং এশার নামায পড়ে ভেতরে যেতেন।

হযরত আব্দুর সাত্তার সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের দাবির পূর্বে– যখন ছোটো মসজিদ বা মসজিদে মুবারক নির্মিত হয়– হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার জামা'ত পড়াতেন। আমরা মাত্র তিনজন সাথে নামায পড়তাম। মিয়া গোলাপ, আব্দুর সাত্তার এবং মিয়া জান মুহাম্মদ সাহেব। হযরত সাহেব যেভাবে নামায পড়াতেন, সেই পদ্ধতি আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রতিটি নামায সময়মতো পড়তেন, বিনয়, নম্রতা ও কাকুতিমিনতির সাথে আদায় করতেন, যেভাবে কোনো শিশু তার বাবা-মায়ের সামনে কেঁদে কেঁদে কিছু চায়। এমন নামাযের আমাদের মুক্তাদীদের হৃদয়ে খুব প্রভাব পড়ত। এটিই প্রথম শিক্ষা যা আমরা পেয়েছি। যখন হযরত সাহেব নামায শেষ করে বসতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতাম– যা নূরানী বা জ্যোতির্ময় হতো এবং আমাদের হৃদয়কে খুব বিমোহিত করত।

পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস (আ.) যে জানাযার নামায পড়াতেন– সুবহানাল্লাহ্! অত্যন্ত চমৎকার এবং একান্ত সুন্নত অনুযায়ী তা পড়াতেন। শত শত বার তাঁকে উপস্থিত ও গায়েবানা জানাযার নামায পড়াতে দেখা এবং তাঁর পেছনে পড়ার সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে।

একবারের ঘটনা; কাদিয়ান নিবাসী মিয়া জান মুহাম্মদ মরহুম ইন্তেকাল করেন। হযরত আকদাস (আ.) জানাযার সাথে সাথে যান। এই মরহুম তাঁর ভক্ত, প্রেমিক ও নিবেদিতপ্রাণ সেবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আকদাসও মরহুম মিয়া জান মুহাম্মদকে খুব ভালোবাসতেন। হযরত আকদাস (আ.) যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, যখন এই মরহুম আসতেন, তখন তিনি সব কাজ ফেলে মরহুমের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

বস্তুত যখন মরহুমের জানাযা কবরস্থানে গেল, তখন হযরত আকদাস (আ.) জানাযার নামায পড়ান এবং তিনি স্বয়ং ইমামতি করেন। নামায এত দীর্ঘ ছিল যে, আমাদের মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করতে থাকে এবং হাত বাঁধা অবস্থায় ব্যথা শুরু হয়। অন্যদের কী অবস্থা হয়েছে আমি জানি না; কিন্তু আমি আমার কথা বলছি যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতি আমার জীবনে কখনো আসে নি। এর কারণ হলো, আমরা তো দুই মিনিটে জানাযার নামায শেষ হতে দেখেছি।

এরপর যখন আমার বুঝলাম ও শিখলাম যে, আসল নামায এটিই– [অর্থাৎ পরবর্তীতে যখন ইবাদতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করলাম;] তখন এটি আমার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে যায় এবং এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি অনুভব হতে থাকে। আর মন চাইত, এখন নামায আরো দীর্ঘ হোক। [অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি (আ.) তাঁর সাহাবীদেরও এমন অভ্যাসে অভ্যস্ত করালেন, নামাযের এমন স্বাদ সৃষ্টি করে দিলেন যে, তারাও আনন্দ পেতে লাগলেন; তারা স্বয়ং এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।] তিনি (রা.) বলেন, যখন জানাযার নামায শেষ হলো, তখন হযরত আকদাস (আ.) বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। এক ব্যক্তি বলেন, হুযূর! নামাযে এত বেশি সময় লেগেছে যে, আমরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছি! হুযূরের কী অবস্থা হয়ে থাকবে? [অর্থাৎ, আপনিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে গেছেন!] হযরত আকদাস (আ.) উত্তরে বলেন:

ক্লান্ত হবার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলাম, তাঁর কাছে এই মরহুমের জন্য মাগফিরাত যাচনা করছিলাম, তাঁর কাছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই মরহুমের জন্য ক্ষমা চাইছিলাম। যে ভিক্ষা চায়, সে কি কখনো ক্লান্ত হয়? যে চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যায়, সে বঞ্চিত থেকে যায়। আমরা ভিক্ষুক আর তিনি দাতা; তাহলে ক্লান্তি কিসের? যার কাছে সামান্য আশাও থাকে, সেখানে ভিক্ষাপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে চাইতে থাকে। সব আশাভরসা তো খোদার কাছে; তিনি 'মু'তি' (দাতা), তিনি 'ওয়াহ্হাব' (পরম দাতা), তিনি 'রহমান' (পরম দয়ালু), তিনি 'রাহীম' (পরম করুণাময়) এবং তিনি মালিক। এছাড়া তিনি আযীয (পরাক্রমশালী)। তাহলে ক্লান্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও এই চিন্তাধারার সাথে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমরা তো হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতও এই অঙ্গীকারের সাথে করেছি যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মোতাবেক নামায আদায় করব। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তাঁর প্রশংসাগীত গেয়ে নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই অঙ্গীকারও পালন করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দুটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হলো মুকাররমা আমাতুশ শরীফ সাহেবার, যিনি নারোয়ালের ডেরিয়ানওয়ালাস্থ মাহমুদ আহমদ বাট

সাহেবের স্ত্রী। তিনি সম্প্রতি চুরাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী গুজরাত জেলার শাদিওয়াল নিবাসী হযরত মৌলভী উমর দীন সাহেব (রা.)-র কন্যা ছিলেন, যিনি নিজের একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে ১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঝিলম সফরের সময় তাঁর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্বামী ছাড়াও ছয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে এবং নাতি-নাতনি রয়েছেন। তার এক ছেলে আসিফ মাহমুদ বাট সাহেব দারুস সালাম, তানজানিয়ায় মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে কর্মরত এবং কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজের মায়ের জানাযা ও দাফনে শামিল হতে পারেন নি। তার এক নাতি ওসামা বাটও এখানে মুরব্বী, একইভাবে তার এক জামাতাও মুরব্বী। এটি ওয়াকেফে যিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী পরিবার।

তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ আসিফ মাহমুদ বাট সাহেব– যিনি তানজানিয়ায় আছেন– তিনি লেখেন, তিনি অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক; তিনি সত্যস্বপ্ন দেখতেন যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হতো। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল, যা তিনি তার বুযুর্গ পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। প্রতিদিন ফজরের পর পাড়ার আহমদী ও অআহমদী ছেলে-মেয়েদের তিনি পবিত্র কুরআন পড়াতেন। তার পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং শোনাও পছন্দ ছিল। তিনি আরো বলেন, আমার কাছেও তিনি শুনতেন এবং যদি কোথাও আমি থেমে যেতাম; আমি যাচাই করতে চাইতাম যে, বার্ধক্য সত্ত্বেও তার মনে আছে কি না, তাই আমি থেমে যেতাম; তখন তিনি অবিলম্বে পরের শব্দগুলো পড়ে দিতেন। পবিত্র কুরআন তার বলতে গেলে প্রায় মুখস্থই ছিল। তিনি বলতেন, বৃদ্ধ বয়সে আমি সব কিছু ভুলে গেছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে পবিত্র কুরআন মনে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলির প্রতি তার অসাধারণ আসক্তি ছিল; সর্বদা কোনো না কোনো বই পড়তেন। একইভাবে 'দুররে সামীন', 'কালামে মাহমুদ', হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নযমের বই– এগুলোর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং অধিকাংশ নযম তার ভালোভাবে মুখস্থ ছিল।

তার জামাতা মুরব্বী সিলসিলাহ মাসউদ সাহেব বলেন, আমি যখন কাদিয়ান যাই তখন তিনি আমাকে বলেন, 'সেখানে বেশি বেশি পায়ে হেঁটে চলবে, কারণ সেখানকার গলিগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পায়ে হেঁটে চলতেন।' আল্লাহ্ তা'লার তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে করা তার দোয়াসমূহ কবুল করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো লাহোরের মুকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেব। তিনিও সম্প্রতি সাতানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রয়েছেন। তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার 'মুখতারে আম' মরহুম শেখ মুহাম্মদ দীন সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ মরহুম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব এবং আরব দেশগুলোর মুবাল্লিগ শেখ নূর আহমদ মুনীর সাহেবের ছোটো ভাই ছিলেন।

তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, মিশুক ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আহমদীয়া জামা'ত লাহোরের নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। চৌধুরী আসাদুল্লাহ্ খান সাহেব ও চৌধুরী হামীদ নসরুল্লাহ্ সাহেবের জেলা আমেলার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি নিজের হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি জামা'তের কাজ সম্পন্ন করতেন এবং মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক জামা'তী সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জামা'তের আর্থিক তাহরীকসমূহে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজের সন্তানদেরও এর উপদেশ দিতেন। খিলাফতের সাথে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল এবং সর্বদা এই সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং সন্তান ও নিকটাত্মীয়দেরও সর্বদা এর শিক্ষা দিতেন। আমিও দেখেছি, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন এবং পরম বিনয়ের সাথে সবার সাথে মেলামেশা করতেন।

তার মেয়ে আসিফা সাঈদুল্লাহ্ বলেন, ফজরের পর তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন, যা আমাদের সব ভাই-বোনের তরবিয়তের কারণ হয়েছে। একইভাবে তার আরেক মেয়ে যিনি এখানেই থাকেন, তিনি বলেন, আমার যখন রাবওয়ায় বিয়ে হয় তখন তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি বড়োই ভাগ্যবতী যে, তুমি রাবওয়া তথা কেন্দ্রে যাচ্ছ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সন্তানদেরও সঠিক তরবিয়ত করার তৌফিক দিন।' তার চিন্তাধারা কেমন দেখুন! ব্যবসায়ী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াদারির কথা বলেন নি, বরং সন্তানদের ধর্ম শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে করা তার দোয়াসমূহ কবুল করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)